পার্থসারথি

"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা

মুদ্রিত সংখ্যার প্রকাশ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ,২০২০

অন্তর্জাল সংখ্যার প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-zine due to prolonged Nationwide Lockdown. Website : https://www.parthasarathipatrika.com

Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. Mob: 9433284720

নবম অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই পৌষ, ১৪২৭ / 24.12.2020

-: সম্পাদক:-

সুনন্দ ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
যীশুখ্রীষ্ট ও স্বামীজি	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ-কবির্মনীষী	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট	শ্রী প্রণব ঘোষ
মুখের খোঁজে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

যীশুখ্রীষ্ট ও স্বামীজি

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন জগতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কম্বুকন্ঠ হইতেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল ‘যত মত তত পথ’ – এই উদার বাণী। সকল ধর্মই সত্য, ঈশ্বরে উপনীত হইবার। এক একটি স্বতন্ত্র পথ। ঠাকুরের এই উদার বাণী শুধু কথার কথা ছিল না। ইহা ছিল তাঁহার সাধনালব্ধ উপলব্ধি। তিনি বৈষ্ণব, তন্ত্র, অদ্বৈত, সুফী, খ্রীষ্ট সকল মতেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর যীশুখ্রীষ্টের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের প্রগাঢ় ভক্তির কথা সর্বজনবিদিত। প্রতি প্রাতে তিনি যীশুখ্রীষ্টের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। চলার পথে গীর্জা দেখিলে তিনি শুধু প্রণাম করিতেন তাহাই নহে, কখনও কখনও বাহিরে সশ্রদ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। খ্রীষ্টোপাসনা দর্শনের কৌতূহলে তিনি লঙ সাহেবের গীর্জায়ও গমন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁহাকে ঠাকুর তাঁহার সকল শক্তি দান করিয়া ‘ফকির’ হইয়াছিলেন, তিনিও ঠাকুরের মতো সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। স্বামীজির লেখা ও বক্তৃতায় সকল ধর্মের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। তবে খ্রীষ্টদেবের প্রতি স্বামীজির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঠাকুরের প্রভাবই ইহার মুল কারণ, সন্দেহ নাই। তবে অন্য কারণও আছে। ব্রাহ্মধর্মের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় “Precepts of Jesus, a guide to peace and happiness” নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক কেশব চন্দ্র সেন বোধহয় যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও ব্যক্তিত্বে সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা, বিশেষ করিয়া, তাঁহার ‘India asks, who is Christ?’ বক্তৃতায় এই প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। রোমাঁ রোলা বলিয়াছেন, “Christ had touched him and it was to be his mission in life to introduce him into the Brahma Samaj, and into the heart of a group of the best minds of India.” স্বামীজি আদিতে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন, তাছাড়া তিনি এক বৎসর হিন্দু কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা তিনি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

স্বামীজি যখন সর্বপ্রথম বিলাতে যান তখন ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধাই ছিল না। কিন্তু ইংরেজ জাতির সমুচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মপ্রবণতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং তাহাদের ধর্ম – খ্রীষ্টধর্মের উদ্গাতা যীশুখ্রীষ্টের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন। Imitation of Christ নামক বিখ্যাত পুস্তকখানি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। মূল পুস্তকখানি সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। খ্রীষ্টধর্মের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শিক্ষা তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। “Give up all that thou hast and follow me.” “Whosoever shall lose his life for my sake, shall find it.”– কথাগুলি তাঁহার অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে অনেক গীর্জা ও ভজনালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বড়দিনের উৎসবে যোগদানের জন্যে তিনি রোমে গিয়াছিলেন আবার মিলানে গিয়া ডি ভিঞ্চির আঁকা Last Supper চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। ক্যাথলিক চার্চের আচার অনুষ্ঠান তাঁহার ভাল লাগিত। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যেও তিনি বেদান্তের বাণীর প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, “I am the son of God.” “I and my father are one.” বেদান্তের শিক্ষাও ‘সোহহম্।’

যীশুখ্রীষ্টের দিব্যত্ব সম্পর্কে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত আছে। ইউনিটারী চার্চ তাঁহাকে একজন মহাপুরুষের বেশী সম্মান দিতে স্বীকৃত হয় নাই। এদেশে রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে শাশ্বত সত্যের উদ্গাতা একজন ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। স্বামীজি বলিয়াছেন, “If I, as an oriental, am to worship Jesus of Nazareth at all, there is only one way open to me, and that is to worship him

DO NOT COPY

as god and nothing else." সুইজারল্যান্ডে তিনি একবার মাতা মেরীর পদমূলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, আর শিশু যীশুর দিকে চাহিয়া বলেন – আজ যীশু সশরীরে থাকিলে আমি অশ্রু নয়, হৃদয় রুধিরে তাঁহার পদ ধৌত করিতাম। – "I would have washed his feet, not with my tears, but with my heart's blood."

Christ, the Messenger– নামক বক্তৃতায় স্বামীজি আবেগমথিত ভাষায় যীশুখ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহার কাছে যীশু মানুষ নয় – দেহহীন, শৃঙ্খলহীন, বন্ধনহীন একটি শাশ্বত আত্মা যিনি এই জীবনের পারে অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, যাঁর জীবন মানুষের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে জাগ্রত করিবার একটি জ্বলন্ত আহ্বান বিশেষ।

স্বামীজির জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। ইউরোপে মধ্যযুগে চার্চই চিরকাল শিক্ষাবিস্তার ও আর্তজনের সেবা করিয়া আসিয়াছে। এ দেশেও খ্রীষ্টান মিশনারীরা শিক্ষাবিস্তার ও আর্তজনের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের এই সেবাদর্শ, খ্রীষ্টান মিশনারীদের সেবার মহান দৃষ্টান্ত স্বামীজির জীবনে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। স্বামীজীও সেবাধর্মের আদর্শ গ্রহণ করেন এবং দেশবাসী বিশেষ করিয়া যুবসম্প্রদায়কে সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তবে সেবাধর্মকে স্বামীজি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিলেন। জীবই শিব, নরের মধ্যেই নারায়ণ – এই জ্ঞানে জীবসেবা প্রবর্তনের জন্য তিনি ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

জনসেবার এই যে আদর্শ স্বামীজি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহার কোন তুলনা নাই। শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই আদর্শ ও অনুপ্রেরণা তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে তিনি যে ধারায় সেবাধর্মের প্রবর্তন করেন তাহার সহিত খ্রীষ্টীয় রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

পত্রে শ্রীশ্রীপ্রীতিকুমার

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

১৯৫৯ সালে আমি বি.এ. পাশ করি। আমাকে খুব কষ্ট করে বিয়ের পর পড়াশুনা করতে হয়েছিল। কলকাতা থেকে অনেক দূরে একটি গণ্ডগ্রামে আমার চাকুরী জীবনের সূত্রপাত। সকালে রওনা হলে সেখানে পৌঁছতে রাত্রিকাল হতো। ছোট ছেলেকে দেখাশুনা করে, চাকুরী বজায় রেখে আমার পড়াশুনা। যে কটি দিন পরীক্ষা ছিল কেবল সেই কটি দিনের ছুটি নিয়ে শ্রীশ্রীপ্রীতিকুমারের শ্যামবাজারের বাসায় থেকে আমি বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলাম। যারা তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত সম্ভবতঃ তাদের মনে আছে শ্রীশ্রীপ্রীতিকুমারের ঘরটি কত ছোট ছিল। সারাদিন ধরে তাঁর কাছে অগণিত লোকজন আসতেন। তাঁদের জন্য আমি ঘরে থাকতে পারতাম না। একটি অপ্রশস্ত প্যাসেজে বসে পড়াশুনা করতে হতো। সেই প্যাসেজটি ছিল যাতায়াতের পথ। যখনই কেউ আসা যাওয়া করতেন আমাকে উঠে দাঁড়াতে হতো। সেসব দিনের বেদনাময় অভিজ্ঞতা আজ হয়তো অধিকাংশেরই মনে নেই। আমি ভুক্তভোগী। আমার কাছে সেসব দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কষ্ট করবার ফল পেলাম। বি.এ. পাশ করে গেলাম। আমার সাফল্যে শ্রীশ্রীপ্রীতিকুমার এত খুশী হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হয়েছিল তিনিই যেন বি.এ. পাশ করলেন। খবর পাওয়া মাত্র তিনি আমার কাছে বিষ্টুকে পাঠিয়েছিলেন। আমি জানি না আজ সে বিষ্টু কোথায় আছে, তবু সেই সময়কে স্মরণ করে আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

৪/৮/৫৯
রাত্রি ১০টা

প্রিয় সাথী,

রাত্রি সাড়ে এগারটায় বি.এ. পরীক্ষার খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টু গিয়ে তোমার পাশের শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো। বিষ্টুর ভিতর বিমল আনন্দ দেখলাম। সন্টু তোমার রোল নম্বর খুঁজে বের করেছে। বাবুর বাবা নীরব শ্রোতা ও দর্শক। তবে আনন্দ ও গর্ব হয়েছে কিনা সেটা বাবুর মা-ই বলুক। তবুও বলি আনন্দ যা হয়েছে তা ভিতরে আছে, বাইরে তার প্রকাশ নেই। জান তো সাধুর সর্ব অবস্থায় সমভাব।

গর্বের অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ আমার স্ত্রী বি.এ., আমাদের বংশের বৌ বি.এ., সকলের উপরে গর্ব বাবু একদিন বলতে পারবে তার মা বি এ, এম এ।

তোমার কষ্ট ও দুঃখ এতদিনে সার্থক হোল এই আমার আনন্দ। আরও আশীর্বাদ করি তুমি আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ কর। এমন আলো তুমি পাবে যে আলোর কাছে আর সব আলো অন্ধকার।

নীরবে নিশীথে অফুরন্ত আদর তোমাকে দিয়েছি। বুকভরা গর্ববোধ করেছি তোমার জন্য। আশায় থাকব কবে তুমি এসে তোমার প্রিয়জনকে আত্মভোলা আবেগভরা প্রেমরসে মাতিয়ে রাখ। বাবুর জন্য অফুরন্ত চুম্বন রইলো তার মায়ের এই কৃতকার্য্যতার জন্য।

তুমি দুঃখের দিনে যেতে বলেছিলে, তাই তোমার সুখের দিনে চর পাঠালুম। ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা ঠিক করে জানাবে। তোমার সুন্দর লিখনীর আশায় অপেক্ষা করব।

আমার হৃদয়ভরা আদর নাও। বাবুকে দিও স্নেহচুম্বন।

ইতি –
তোমার প্রীতিকুমার

পুনশ্চঃ- সুধীরবাবুকে (পালিত) অর্থাৎ মেজদাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি দিও। মাকে তোমার নিজের হাতে চিঠি দিও। তোমার বাবাকে চিঠি দিও। চন্দ্র পিসেমশাইকেও চিঠি দিও।

আনন্দ সংবাদের সঙ্গে মিষ্টি পাঠালাম। আর টাকা পাঠাচ্ছি মাংস খাবার জন্য।

এইমাত্র তোমার Express Letter ও Post Card পেলাম। রেণু পিসীর সঙ্গে যদি পাকাপাকি কথা হয়ে থাকে তবে চলে এসো।

নিয়মমাফিক Resign করতে হয়। যা করতে হয় জেনে সেইভাবে কাজ করে চলে এসো। যতদূর যা সম্ভব তা গুছিয়ে ঘরে তালা দিয়ে চলে এস। বিছানা, ষ্টোভ ইত্যাদি যা যা নিত্য প্রয়োজন সব নিয়ে এসো। আসবার সময় কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে এসো না। সমস্ত দিকে সমতা রক্ষা করা ঠিক। কুকুরে কামড়ালে ফিরে কামড়াতে নেই। ঁমা ওদের সাজা দেবেন। ভাবনা কোর না। কেক, বিস্কুট ও রুটি পাঠালাম।

9th August লিখিত ভাবে দেখা করতে বলে থাকলে চলে আসবে।

ইতি –

****

(তারিখ নেই)

প্রিয় সাথী,

তোমার Post Card ও দুটি Inland Letter পেয়েছি। ভানুর হাতে চিঠি পেলাম, বিষ্টু যাচ্ছে।

তোমার চিঠির জবাব সংক্ষেপে দিচ্ছি। যদি তুমি আমার জীবনধারার প্রতি ও আমার প্রতি উদার ভাবে দৃষ্টি দাও তবে মনে হয় জীবনে কোথাও আক্ষেপ বা অসন্তোষ জমবার অবকাশ হবেনা। তোমাকে রাখতে হবে আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আর তোমাকে রাখতে হবে ধৈর্য ও বিচারণা। তবেই সব কিছু সুন্দর হবে। তুমি শুধু লক্ষ্য করে যাও আমি কি কর্তব্য করি। তোমার প্রতি আজও আমার অগাধ ভালবাসা আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে। আমার জীবনে তোমার সম্বন্ধে অভাববোধ আছে। আছে অনেক কিছু তোমাকে নিয়ে। কিন্তু আমি নীরবে যে কাজ ও ভালবাসা দেখাই, উপভোগ করি ও করাই, সেই আমার সব। বাইরে আমি রুক্ষ হলেও অন্তরে আমি তোমার একান্তজন। জীবনে চলার পথে ভুল ও অন্যায়, বাহুল্য আমার নীতিবিরুদ্ধ।

DO NOT COPY

স্বচ্ছলতা ও বিলাস পছন্দ করি, সৌন্দর্য্যবোধ খুবই পছন্দ করি কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাক্স ভর্তি জামাকাপড় থাকা। তুমি সাজলে ভাল লাগে, তোমাকে সাজাতে ভাল লাগে, কিন্তু যা আছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আমিতো বলেছি আমার কথা শুনে চল, বাধ্য হও, প্রিয়পাত্রী হও, সুখ তোমার হবেই। কাম ও কামনা যাদের বেশী তারা জীবনে সুখী হতে পারে না। তারা অন্যের সুখ দেখলেও জ্বলে যায়। আমার যেমন সংসারের প্রতি কর্তব্য আছে, তোমারও তেমনি আছে। তুমি সকলের হয়ে চিন্তা কর, সকলকে ভালোবাস। দেখবে একদিন না একদিন তারাও তোমাকে ভালোবাসবে। আমি এই পথ নিয়েছি তাই আমার জীবনে অফুরন্ত ভালবাসা আছে। তাই আপনজনের দেওয়া শত ব্যথা ঐ অতলে তলিয়ে যায়। তুমিও স্বার্থ ত্যাগ করে তাদের মতো আমার পথ ও জীবনকে ভালবাস, দেখবে তোমার অনুগত দাস হয়ে আছি। ভক্তের কাছে ভগবানও হেরে যান। আমি যে ভাবে আমার জীবন-মন দিয়ে তোমাকে ভালবাসি, তুমি তার চার ভাগের এক ভাগ আমাকে ভালবেসো, দেখবে তোমার ঐ দৃষ্টিতে, তোমার কাছে আমি কত সুন্দর। সমস্ত চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে থেকে আমাকে ভালবাসতে হয়। স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। তবেই না আপন করা যায়। কাম ও কামনাকে যত বেশী দাবিয়ে রাখবে প্রেম ও ভালবাসার শাশ্বত সত্য তত বেশী উপলব্ধি করতে পারবে।

আমার ভিতরেও কাম ও কামনা আছে, কিন্তু তাকে সত্যের পথেই নিতে চেষ্টা করি। তুমি একটি মন্ত্র নাও সেটি এই জীবনে একমাত্র ব্রত স্বামীকে সুখী দেখব, তাঁর জীবনকে আনন্দময় করব আর পুত্রের জন্য সমস্ত রকম স্বার্থ ত্যাগ করব। জগতের সমস্ত লোকের সঙ্গে মধুর ব্যবহার রাখব। পারবে?

বাবুকে আমার স্নেহচুম্বন দিও। তুমি আমার আদর নিও।

ইতি -

প্রীতিকুমার

৮/৯/৫৯

প্রিয় সাথী,

৩/৪ দিন হোল Keonjhar এসেছি। এখানে Post Office নেই, লোকবসতি নেই শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। ভাল্লুক, বাঘ ইত্যাদি। পাহাড়ের উপরে আছি। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর, কিন্তু বিপদ এর চারপাশে। কাল যাব Keonjhar রাজকুমারের প্রাসাদে। সেখানে একদিন থেকে আবার রাঁচি যাব। তারপর তোমার কাছে যাব। আর থাকবার ইচ্ছে নেই। মন চলে গেছে কলকাতায়।

প্রাণভরে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছি। যেখানে যা কিছু দেখবার ছিল সব দেখেছি। কিছু বাকী নেই। জীবনে বহু দিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যা হয়তো বা কারও ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগবে। মন হালকা হয়ে গেছে। প্রাণে নূতনের সাড়া জেগেছে। প্রতি পদে আজ সত্যের শাশ্বত স্পন্দন জেগে উঠছে। প্রিয়জনের কাছে যাবার জন্য আজ ব্যাকুল হয়েছি। বাবুর ছোট্ট মুখখানি পিতৃহৃদয়ে কেবলই দোলা দেয়, কাছে পেতে চায়।

তোমাদের কোনও খবর না পেয়ে এক এক সময় বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তাই আর থাকবার ইচ্ছে নেই।

বাবুকে আমার স্নেহচুম্বন দিও। তুমি আদর নিও।

ইতি -

প্রীতিকুমার

"পরার্থে এতটুকু করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

DO NOT COPY

শ্রীঅরবিন্দ-কবির্মনীষী

শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোহসৌ পুরুষঃ, কে সে, আমি কি সেই- এই প্রশ্ন মানুষের শাশ্বত চিদাকাশে চিরকালীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী গেছে, কত কথা ও কাহিনী লুপ্তসুপ্ত হয়েছে ইতিহাসের অতিআপাত দৃষ্টিতে, তার পাতায় পাতায় আঁকা জোঁকা হয়েছে কতো লাস্যহাস্য, কতো কামক্লেশক্লেদ, কতো বিদ্যাবুদ্ধির নৈবেদ্য। মানুষ ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ ছাড়িয়ে, দুপায়ে দাঁড়িয়ে বলেছে- আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই, হে পরমরহস্য দেখা দাও, দেখা দাও, নয়নপথগামী হও -কে তুমি, কী তুমি, কোথায় তুমি। মনগড়া আংশিকভাবে সত্য উত্তর সে পেয়েছে। সে আবার বসেছে ধ্যানে, আবার প্রশ্ন করেছে কে তুমি- কী তুমি- প্রথম দিনের সূর্য যে প্রশ্ন করেছিল, পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে প্রশ্ন আজও ধ্বনিত কবির কন্ঠে, কে তুমি- মেলেনি উত্তর। যুগযুগান্তর ধরে এই বিরাট বিশাল দেশের পথে ঘাটে মাঠে বাটে প্রান্তরে অরণ্যে, কন্যাকুমারিকা থেকে বদরিকায়, পরশুরামক্ষেত্র থেকে দ্বারকায়, তার হিমমজ্জিত উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, তার তরঙ্গমুখর সমুদ্রতটে বসে আছেন জ্ঞানীগুণী ধ্যানীর দল, চলেছেন ভক্তরা ও কর্মীরা। আবার কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী, কেউ বা সংশয়বাদী, নিজেই নিজের বৈরী – তবু সে ছুটেছে গুরুর কাছে, জ্ঞানীর কাছে, বিচার বিতর্ক বিশ্লেষণ করেছে, করেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা বীক্ষণাগারে। সে চলেছে দূর দূরান্তরে – তার কামনা – সে জানতে চায়, শিখতে চায়, বুঝতে চায়, রসিয়ে জবিয়ে রাঙিয়ে রঙ্গিয়ে সবার রং এ রং মিশিয়ে।

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
না, না, সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়;
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়
জানে না সে কাহারে চায়
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি-----

তাই নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে পথের নির্দেশ খোঁজে, প্রশ্নের উত্তর চায়, হয়তো উত্তর পায় নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষাদীক্ষা বিচার অধিকার ভেদে

স্তম্ভিত তমিস্র-পুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্ম মন্ত্র আনন্দিত ঋষি কন্ঠতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি
পীড়িত ভুবন লাগি, মহাযোগী করুণা কাতর তাই সারা বিশ্ব জুড়ে।

এই তপস্বী মনস্বী যোগক্ষেম পুরুষদের নারীদের একটি অবিচ্ছিন্ন মিছিল চলেছে। মানস সরসের অন্তঃহীন যাত্রী তাঁরা, হংস বলাকার দল- চরৈবেতি, চরৈবেতি-এগিয়ে চলো-

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনখানে।

অথচ এইখানেই তা আছে- ইহৈব- এই মাটির উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে, যে দৃষ্টি সৃষ্টি উর্ধ থেকে উর্ধলোকের আস্পৃহা নিয়ে উঠবে অনন্তের দিকে, অসীমের রাজ্যে, সীমাহীনের সীমায়- কবির কণ্ঠে ধ্বনিত রণিত হবে- Nothing ends, all but begun।

বৈদিক ঋষির দিন থেকে আজকে শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরমন পর্যন্ত সেই একই কথা, সেই একই যাত্রা, অদ্যবধি সেই লীলা করে গৌর রায়। জানি আজকের দিনের বাস্তববাদী বন্ধুরা একটু নিছক মুচকি হেসে বলবেন যে ইতিহাস কল্পনাপ্রবণতাকে বা ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দেয় না, জীবনের চর্যাপদে রোমান্টিক মর্বিডিটির স্থান নেই। কথাটা কতটা সত্য সেটা বিচার করে দেখবার মত মেধা, মনীষা বা ক্ষুরধার বুদ্ধি আমার নেই, শুধু ভাবি যে তাই যদি হবে, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র শুদ্ধ লুব্ধ জীবনেও তো প্রমাণ পেয়েছি যে এই ভারতবর্ষই সেদিন দিয়েছে গান্ধীজীর মত লোকোত্তর কর্মী, রবীন্দ্রনাথের মত অলোকসামান্য কবি, শ্রীঅরবিন্দের মত যোগক্ষেম মহাতাপসকে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ তো আমার পিতাপিতামহের দেখা লোক।

DO NOT COPY

রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের কথা নাই বা তুললাম। আমরা চর্মচক্ষে যাদের দেখেছি সেই ত্রয়ীর কথাই মনে পড়ছে- গান্ধী রবীন্দ্র অরবিন্দ। এঁরা কি Freaks of nature না ইতিহাসের পুরাগামিনী গতির অমোঘ স্ফুলিঙ্গ? হয়তো এদেশের মানসিকতার মূলে এমন এক অমৃত সিঞ্চন আছে যে সাময়িক বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর সুষুপ্তি নামলেও, সত্যদর্শনে ব্যঘাত ঘটে না এবং তার সততা শুধু ভাবের আবেগে নয়, বিচারের বিশ্লেষণে নয়, তপস্যাপূত উপলব্ধিতেও।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে কবিগুরুর দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই। ঠিক এই কথাই শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে বলা যায়। সাধারণ লোকে জানে যে তিনি একজন মহাযোগী, মহাতাপস, মহাসাধক। তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রমের নামের সঙ্গে সকলেই সুপরিচিত। তাঁর আর একটি পরিচয়ও সকলে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করে যে তিনি এককালে উগ্র রকমের স্বাদেশিক বিপ্লবপন্থী নেতা ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কথায় "স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি"। আর তিনি ছিলেন একজন পরম পণ্ডিত। যেমন মনের অভীপ্সা তেমনি সংগ্রহ ও আগ্রহ।

তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাও নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন-

সেখানেই আরাম লজ্জিত শির নত করে, মৃত্যুভয় ভুলে, মহাবীরেরা যান সংকট যাত্রায়, কবি গান বজ্ররবে মহাগীত। তাঁর তথাকথিত পলিটিকাল লাইফের চার বছর কাটে কলকাতায়। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, কর্মযোগীন, ধর্ম প্রভৃতি পত্রিকার ছত্রে ছত্রে সে আগুন, সে মনস্বিতা, সে তীব্রতা, সে তেজ সে বীর্য ছড়ানো। সে এক অপূর্ব উন্মাদনার যুগ। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর নামকরণ করেছিলেন- মানস সরোবরের অরবিন্দ- কিন্তু তিনি কোন দলের নন, সকলের- তিনি বলতেন- Bhakti is the leaping flame, Shakti is the fuel- ভক্তি হচ্ছে ঊর্ধমুখী অগ্নিশিখা, শক্তি তার ইন্ধন। ভারতবর্ষকে হতে হবে শক্তিমান, বীর্যবান, নির্লোভ তপস্বী, মনস্বী, জ্ঞানী- এই তার সনাতন আত্মার পরিচয়, এই তার সন্তানদের নিয়তি। তার একহাতে থাকবে শঙ্কাহরণ মন্ত্র আর এক হাতে খড়্গ। একদিকে বরাভয়, আর একদিকে অসি-খর্পর। "মন্দির গড়ো", ভবানীর মন্দির এই আদেশ নাকি তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে। ১৯০৪ সালে গুরুবরণ না করেই শ্রীঅরবিন্দ যোগাভ্যাস শুরু করেন। কয়েক বৎসর পরে মারাঠী যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন। আলিপুর জেলের অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বলে গেছেন- তাঁর শক্তি (বাসুদেব সর্বমিতি) আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতির উপলব্ধি দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন। রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্খা না রেখে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে। লেলে আমাকে যখন দীক্ষা দিলেন তখন আমি এই সত্যটা জানতাম না যে জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হলে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্বসমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছান যথেষ্ট নয়- তা সে মানুষ যতই অসামান্য হোক না কেন। বিশ্বমানবকে হতে হবে অমৃতের অধিকারী। শুধু উপরের আলো নামতে রাজী হলেই হবে না, যদি নীচের আধার অর্থাৎ গ্রহীতার আধার তাকে ধারণ না করতে পারে... আমি চাই উর্ধতর লোকের এমন আলো এ জগতে আনতে, এমন শক্তি এখানে সক্রিয় করতে- যার ফলে মানব প্রকৃতির হবে খুব একটা বড় রকমের অদল বদল, ওলোট পালট। এমন কোন দিব্য শক্তি-যা এ পর্যন্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হয়নি। এই আলিপুর জেলেই তিনি বিদেহী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৬ সালের ১০ই জুলাই-এর বৈকালিক আলোচনায় দেখি(যা তাঁর জীবন চরিতলেখক পুরানী উদ্ধৃত করেছেন এবং পরে নীরদবরণের সঙ্গে সান্ধ্যালাপেও (Evening Talks) আছে Vivekananda came and gave me the knowledge of intuitive mentality. I had not the least idea about it at that time. He too had not got it when he was in body. He gave me the detailed knowledge illustrating each point, the contact lasted for about three weeks and then he withdrew.

DO NOT COPY

তিনি যখন এর অব্যবহিত পরেই পন্ডিচেরীতে তাঁর তপস্যার গুহায় আশ্রয় নিলেন, তখন একদল লোক উচ্চনিনাদে বলতে লাগলো– তিনি Escapist. ‘এবার মোরে বিদায় দেহ ভাই, রাজনীতির ভাঙ্গাগড়ায় আমি আর নাই,”– কেননা, তিনি ভয়ে পালিয়েছেন। তারা বুঝতে চাইলেন না যে তাঁর এই পন্ডিচেরী বাস তাঁর সাধনারই অঙ্গ, আর এক রূপ– ক্ষাত্র তেজই একমাত্র তেজ নয়, ব্রহ্ম তেজও আছে। তাই ১৯১০–৫০ এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তিনি আত্মসমাহিতির মধ্যেই কাটালেন, ক্লান্ত শ্রান্ত পর্য্যুদস্ত হয়ে নয়, আমূল পরিবর্তনের পন্থা আবিষ্কার করতে, উর্ধতর লোকের এক আলোকে নামিয়ে আনতে যাতে বিশ্বমানবের সমগ্রভাবে রূপান্তর হয়। এই কল্পনাই রূপ পেয়েছে তাঁর মহারচনা “সাবিত্রী”তে রসে স্নিগ্ধ হয়ে, প্রেমে পূর্ণ হয়ে, সাধনায় ব্যাপ্ত হয়ে। সাবিত্রীতে সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে এক মহাসাগরে। এখানে আমরা শুধু কাব্য, ছন্দ, ভাষার বিন্যাস, “রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্” গতি ও ঝঙ্কার চিত্রকল্পের প্রাচুর্য, চিন্তার প্রখরতা, অসীম বিস্তার, ভাবের গাম্ভীর্যই পাই না, এখানে দর্শন কাব্য ও সাধনার ত্রিকায় ত্রিকালে এসে মিশেছে অনন্তের রাজ্যে, অচিন্ত্যনীয়ের পথে, অনির্বাণের সুরে। গুরুগম্ভীর, সন্দেহ নেই, কিন্তু মহাকালের কোলে মহাকালীর যে লীলা (Time and Timelessness) চলছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য সাবিত্রী। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানব চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে, আর সেই আলো দেখে উত্তরণের পথ বেয়ে অবতরণ করবেন স্বর্গের দেবতা মাটির ঘরে। এই স্বর্গ মর্তের মিলনের মধ্যেই ঘটবে শুধু রূপান্তর নয়, গোত্রান্তর নয়, অচিন্ত্য ভেদাভেদ লীলার প্রকাশ। মানুষ শুধু ধ্যানে নয়, জ্ঞানে নয়, কর্মে নয়, ভক্তিতে নয়, ‘সর্বভাবেন ভারত’ সর্বভাবে সেই শাশ্বতের আশ্রয়ে মহাশান্তি লাভ করবে এবং ইন্দ্রিয়ের পারে যে মন, মনের পারে যে দীপ্যমান বোধি এবং বোধির পরে যে অধিমানস, অতিমানস পরম তত্ত্ব, যিনি মাত্র একাংশের দ্বারা জগৎ ধারণ করে আছেন, তিনি সর্বাংশ অখন্ড সত্ত্বায় অবতরণ করে মর্তের মানসভূমির উপরে অরূপের ও অপরূপের তুলিকার স্পর্শ দিয়ে সর্ব জন্মে তাহার নবদ্বিজত্ব সম্পাদন করবেন। এই তো স্বপ্ন, এই তো সার্থকতা, এই তো সিদ্ধি।

মধ্যযুগীয় সন্ত কবি দাদুর মুখে শুনেছিঃ–

জ্ঞানলহরী জঁহ তেঁ উঠে বাণী কা পরকাশ
অনুভব জঁহ তেঁ উপজে সবদ কিয়া নিবাস
জঁহ তনমন কা মূল হৈঁ উপজ ওঁকার
তঁহ দাদু নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার।

জ্ঞানলহরী যেখানে ওঠে, সেখানেই তো বাণীর প্রকাশ, যেখানে অনুভূতি থেকে অনুভূতিতে আসি সেখানেই তো শব্দের নিবাস। তনু আর মন মিলনেই জাগ্রত হন ওঁকার। দাদু বলেন যে তিনি সেই সঙ্গম স্থলেই পেয়েছেন সবচেয়ে বড় নিধি। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী পড়তে পড়তে এই কথাই মনে পড়ে যে কেন আমরা কবিকে বলি মনীষী অর্থাৎ তিনি যে রূপকল্প ভাবনায় এনেছেন, কাব্যে রূপ দিয়েছেন তা তিনি মনে সত্যিকার পেয়েছেন, তা সম্পূর্ণ ভাবে এসেছে তাঁর জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে, নিদিধ্যাসনে। তাঁর কাব্যের প্রতিমূর্তিগুলি শুধু বাক্যের বিন্যাস নয়, রচনা শৈলী নয়, ভাবের অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা নয়; অনুভূতিতে প্রাপ্ত সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলতেন– “কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, হওয়ার দ্বারা পেতে হয়।” শ্রীঅরবিন্দেরও সেই কথা– “The measure of a man is .... by what he becomes.”

“মাথায় জটা ধারণ করলে, গায়ে ছাই মাখলে বা মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সোহহম্ সত্যকে প্রকাশ করা হল, এমন কথা যে মনে করে সে অহংকৃত”–

কিন্তু সব অগ্রগমণের মূলে থাকা চাই আস্পৃহা– যাকে বৈদিক কবিরা symbolize (প্রতীক) করে গেছেন অগ্নিরূপে– এগিয়ে নিয়ে যায় যে ‘অগ্রম্ নয়তি অগ্রনী’– সেই অগ্নিই আগে আগে চলে উর্ধের দিকে লেলিহান শিখা বিস্তার করে– তাই অগ্নিই পুরোহিত। অগ্নিমীলে পুরোহিতং।

কালো থেকে আলোয় যাবার সুড়ঙ্গটি তো মহাতামসীর আধার – প্রাণপুরুষ হচ্ছেন বেগবান অশ্ব,– অশ্বপতি তাই উর্ধাগামী মানবাত্মার প্রতীক

কেননা প্রাণকে যথেচ্ছ চালাবার ও সংহত করবার বলগা মানুষের হাতে আসে, তপস্যাপূত হলে। মহাভারতের একটি প্রাচীন কাহিনী (Legend)টিকে প্রতীক করে(Symbol) নিয়ে বছরের পর বছর, শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রী কাব্য লিখতে বসলেন সারা জীবনের সত্য অনুভূতিতে রঙিন। অশ্বপতির তপস্যায় মানুষের উত্তরণ, সাবিত্রীর কাহিনীতে তার অবতরণ, নিঃসন্তান অশ্বপতির যোগে যে গল্পের শুরু সাবিত্রীর মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনায় তার শেষ। এই তো মানুষের জয় যাত্রার আন্তর ইতিহাসের এক একটি গ্রন্থিমোচন, এক একটি পর্ব। সে জয়ের জন্য চাই নিষ্ঠা, চাই প্রেম, চাই সাধনা, চাই সত্যে আগ্রহ। সত্যবানকে পাওয়া যায় সত্যে বিধৃত হলেই। শ্রীঅরবিন্দের অশ্বপতি করলেন মানস যাত্রা স্বর্গ মর্ত্য আকাশ ভেদ করে অসীমের পথে অনন্তের রাজ্যে, যে পথের শেষ নেই, কাল থেকে কালান্তরে যাত্রা। তিনি মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি, তিনি শেষ কথা জানতে চান অশেষের কাছে, কিন্তু–

Nothing ends, all but begun.
শেষ নেই সমাপ্তি নেই, নেই অবসান।

প্রতি পদক্ষেপেই নূতন করে আরম্ভের গান। শেষই যদি আরম্ভ হয়, তা হলে মৃত্যু কোথায়, সবই অমৃতময়। সবিতৃ হতেই সাবিত্রীর উৎপত্তি। সবিতা আলোর দেবতা, সু মানে প্রজনন, সৃষ্টি, তাই সবিতা, জগতের প্রসবিতাও বটে। স্বর্গীয় সুধা 'সোম' ও ঐ 'সু' হতে উদ্ভুত, আনন্দের চিহ্ন। তাই অশ্বপতিকে জানতে হয়েছিল যে নেতিত্বের মধ্যে দিয়েই সব পাওয়া যায় না মহতীপ্রাপ্তি হয় না। তবু মহাশক্তি নামতে রাজী হয়েছিলেন সাবিত্রী রূপে, মৃত্যুকে জয় করবার যোগকৌশল দেখাবার জন্য, কিন্তু–

O soul, it is too early to rejoice
Thou hast reached the boundless silence of the self
… … …

Only the everlasting No has neared …।

তুমি এসেছ নেতৃত্বের গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে, তোমার মনকে কেড়ে নিয়েছেন সেই তুঙ্গনাথের নিশ্চলা সমাহিতি– তাই শ্রী অরবিন্দের কাছে নির্বান, সমাধি, মুক্তি শেষ কথা নয় তারপরেও সাধনার আর এক স্তর আছে যে আনে সাম্যাবস্থা, তাই তাঁর প্রশ্নঃ

But where is the Lover`s Everlasting yes? কোথায় সেই চিরপশ্যন্তী বাণী, প্রেমিকের হাঁ, নেতি নয়, ইতি, আমি আছি, তুমি আছ, তবেই সত্য স্থির আছে–তত্ত্বজ্ঞানীর 'না' উঠবে 'হাঁ' হয়ে।

The bridge between the rapture and the calm
The passion and the beauty of the bride
The chamber where the glorious enemies kiss
The Smile that saves the golden peak of things …

একদিকে চঞ্চল জীবনের 'grand passion' আর একদিকে শান্তির পারাবার নৈঃশব্দের তটভূমি– সেইখানেই বসে আছেন দীপ্ত অর্ধনারীশ্বর পুজোর বেদীতে। একদিকে তাঁর কপোল মালা, আর একদিকে মন্দারমালা পরিশোভিত, নব জীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যাম ও শ্যামা, শিব ও শিবাণী, প্রকৃতি আর পুরুষ, সাবিত্রী ও সত্যবান, রাধা আর কৃষ্ণ সমাসীন আর তারই মাঝে

কুহেলী গেলো, আকাশে আলো দিল যে
পরকাশি ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি ……

জীবন যে নঞর্থক নয় সদর্থক– ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, সর্বগত শিবকে জাগাতে হবে প্রতিটি অনুতে নব নব ছন্দে নব আনন্দে, এই বার্তাই নিয়ে আসেন, আজকের ঋষি কবি সাবিত্রীতে। তাই নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার দিয়েই চিন্ময় আলোকে উদ্ভাসিত হয় সমস্ত জীবন, শেষ নেই অশেষের, অবসান নেই, সমাপ্তি নেই– প্রজ্ঞায় প্রোজ্জল প্রেমের কনকবিভায় অনুরঞ্জিত অরুণার্ক রাগে দীপ্ত সেই দিনটির, ক্ষণটির, লগ্নটির প্রতীক্ষায় বসে থাকবে মানুষ তার সমস্ত তপোবল নিয়ে। সাবিত্রীর সুরু হয়েছিল– It was the hour before the Gods awake, অর্থাৎ অতিনিশায় দেবতাদের জাগৃতির পূর্বক্ষণে আর তার শেষ হল মহাতামসীর

DO NOT COPY

গর্ভ হতে যেদিন জন্ম নেবে নূতন দিন, নূতন মানুষ, নূতন দেবতা তারই অমেয় আশায় কারণ কালরাত্রি, মহারাত্রিই লালন করেন তাঁর বুকে নবনবোন্মেষশালিনী প্রত্যূষকে–

And in her bosom nursed a greater dawn. এই কাব্যের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ছেড়ে দিয়ে নিছক কাব্য হিসাবে যদি বিচার করা যায় তাহলে এর শব্দ সম্ভারের, রূপকল্পের, বৈচিত্রের বিশালতায় (Immensity) মুগ্ধ হতে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট **শ্রী প্রণব ঘোষ**

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সাধনার কথা সুবিদিত। তিনি হিন্দু ধর্মের ভক্তি, তন্ত্র এবং বেদান্ত মত ছাড়াও ইসলাম মতেও সাধনা করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম মতে সাধনা না করলেও একটানা তিন দিন খৃষ্টীয় ভাবে আচ্ছন্ন থাকার পর স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার শম্ভুনাথ মল্লিক কিছুদিন তাঁকে বাইবেল পড়ে শুনিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য অমৃতপুরুষ যীশুর অনন্য জীবন ও শিক্ষার কাহিনী তাঁর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। একদিন রাসমণির মন্দির সংলগ্ন যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় মাতৃকোলে যীশুর একখানা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তন্ময় হয়ে ছবিখানা দেখতে দেখতে তিনি যীশুর অপূর্ব জীবন কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময় দেখলেন ছবিখানা যেন জীবন্ত ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। দেবশিশু যীশু ও মা মেরীর দিব্য অঙ্গ থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি তাঁর ভিতরে প্রবেশ করল। তিনি অনুভব করলেন এর ফলে যেন তাঁর মন থেকে জন্মগত হিন্দু সংস্কার চলে গেল এবং ভিন্ন একটি ভাবের উদয় হল। তিনি চেষ্টা করেও ঐ ভাব প্রতিরোধ করতে পারলেন না। যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রবর্তিত খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগল। তিনি ভাবে দেখতে লাগলেন গীর্জায় খ্রীষ্টান পাদরিরা যীশুখ্রীষ্টের মূর্তির সামনে ধূপদীপ দিচ্ছে এবং কাতর প্রার্থনায় অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে। নিজের ঘরে ফিরে গিয়েও তাঁর ঐ ভাবের উপশম হয়নি। তিন দিন তিনি ঐ ভাবেই আচ্ছন্ন ছিলেন এবং একই ধরণের দৃশ্য নিরন্তর তাঁর মানসচক্ষুর সন্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছিল। ঐ তিন দিন তিনি কালী মন্দিরে যেতেও ভুলে গিয়েছিলেন। তিন দিন পরে পঞ্চবটীতে বেড়াতে তিনি দেখেন সুন্দর গৌরবর্ণ এক দেবমানব তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন।তাঁকে দেখে ঠাকুরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, যে তিনি ভিন্নদেশীয়। তাঁর মুখের অপূর্ব দিব্যভাব দেখে তিনি মুগ্ধ চিত্তে ভাবতে থাকেন, কে ইনি? অমনি তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধ্বনিত হয়ঃ "ঈশামসি–পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি।" যীশুখ্রীষ্ট ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাঁর শরীরে লীন হয়ে গেলেন। ঠাকুর তখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁর মন সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল। এই দর্শনের পর যীশুখ্রীষ্টের অবতারত্ব সম্পর্কে ঠাকুর নিঃসংশয় হলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, মা সীতা ও রাধারাণীও তাঁর শ্রীঅঙ্গে একই ভাবে লীন হয়েছিলেন।

ঈশামসির এই দিব্যরূপ ঠাকুরের মানস পটে চিরাঙ্কিত ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর ত্যাগী সন্তান শরৎচন্দ্রকে (স্বামী সারদানন্দ) প্রশ্ন করেছিলেন, "হাঁরে, তোরা তো বাইবেল পড়েছিস, বল দেখি তাতে ঈশার শরীরের গড়ন সম্বন্ধে কি লেখা আছে? শরৎচন্দ্র বলেন, ওকথা বাইবেলের কোথাও পাইনি, তবে তিনি ইহুদি জাতিতে জন্মেছিলেন, সেজন্যে সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন, তাঁর চোখ টানা আর নাক লম্বা টিকালো ছিল নিশ্চয়ই। তখন ঠাকুর বলেন, "কিন্তু আমি দেখেছি তাঁর নাক একটু চাপা। কেন অমন দেখেছিলুম কে জানে।" পরে অবশ্য শরৎচন্দ্র জানতে পারেন যীশুখ্রীষ্টের শরীরের গঠন সম্পর্কে তিন প্রকার বিবরণ আছে এবং একটি বিবরণে তাঁর নাক চাপা ছিল বলে উল্লেখ আছে।

ঠাকুর ভিন্ন মতে সাধনা করে বুঝেলেন প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরে পৌঁছবার এক একটি পথ বিশেষ– যত মত তত পথ। খ্রীষ্টধর্মের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল। কথামৃতে আছে জগন্মাতার উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন, "(মা) তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে? তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছান যায়। মা, খৃষ্টানরা গির্জাতে তোমাকে কি করে ডাকে, একবার দেখিও! কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী ঘরে যদি ঢুকতে না দেয়? তবে গির্জার দোরগোড়া থেকে দেখিও।"

(কথামৃত ৫/১/১)

শোনা যায় কলকাতার আর্মহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সেন্ট পলস্ স্কুল সংলগ্ন ট্রিনিটি চার্চের দোরগোড়া থেকে খ্রীষ্টান উপাসনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য ছিল! কথামৃতকার সেই সাদৃশ্যের প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উভয়ের কথোপকথন নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ

মণি (কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছদ্ম নাম)-ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখ্রীষ্টও অন্য লোকের মত কেঁদেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি হয়েছিল?

মণি মার্থা, মেরী দুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস ভাই তিনজনই যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয়। যীশু তাদের বাড়ীতে আসছিলেন। পথে একজন ভগ্নী (মেরী) দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে বললে, 'প্রভু, তুমি যদি আসতে, তাহলে সে মরতো না।' যীশু তার কান্না দেখে কেঁদেছিলেন। তারপর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো!"

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমার কিন্তু উগুনো হয় না।

মণি- সে আপনি করেন না-ইচ্ছা করে। ও সব সিদ্ধাই, তাই আপনি করেন না। ওসব করলে লোকেদের দেহেতেই মন যাবে-শুদ্ধাভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না।

আপনার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের অনেক মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – আর কি মেলে?

মণি – আপনি ভক্তদের উপবাস করতে কি অন্য কোন কঠোরতা করতে বলেন না- খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নিয়ম নেই। যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যরা রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত তারা তিরস্কার করেছিল! যীশু বল্লেন, ওঁরা খাবে খুব আনন্দ করবে; যতদিন বরের সঙ্গে আছে, বরযাত্রীরা আনন্দই করবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ- এর মানে কি?

মণি- অর্থাৎ যতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেবল আনন্দই করবে-কেন নিরানন্দ হবে? তিনি যখন স্বধামে চলে যাবেন; তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-(সহাস্যে) আর কিছু মেলে?

মনি-আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন- ছোকরাদের ভিতর কামিনী কাঞ্চন ঢুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণ করতে পারবে – যেমন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে; তিনিও সেইরূপ বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ – কি বলতেন?

মণি – পুরানো বোতলে নূতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে আর 'পুরানো কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।'

আপনি যেমন বলেন, 'মা আর আপনি এক,' তিনিও তেমনি বলতেন, বাবা আর আমি এক।' (I and my father are one)।

শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে) আর কিছু?

মণি – আপনি যেমন বলেন, 'ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন'। তিনিও বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো দোর খোলা পাবে'। (Knock and it shall be opened unto you).

(কথামৃত ৪/৫/২)

ঠাকুর তাঁর পার্ষদদের মধ্যে দুইজনকে যীশুখ্রীষ্টের সাঙ্গোপাঙ্গ বলে চিনতে পেরেছিলান। তিনি একদিন বলেছিলেন, শশী আর শরতকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্কের দলে।' ঠাকুর যীশুখ্রীষ্টকে ঋষি কৃষ্ণ বলে উল্লেখ করতেন।

কিছু খৃষ্টান সাধকও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টকে দর্শন করেন। উইলিয়াম নামে একজন খ্রীষ্টভক্ত কলকাতায় এসে ঠাকুরের কথা শোনেন এবং দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁকে দর্শন করেন।

নাম উইলিয়ম পণ্ডিত বাইবেলে।
ধীর নম্র বিনয়ী জনম উচ্চকূলে।।

ঠাকুর তাঁকে সাদরে নিজকক্ষে নিয়ে যান।

ঝটিতি বহিরভাগে বিদ্যুতের প্রায়।
উপনীত দাঁড়াইয়া সাহেব যেথায়।।
পরশ করিয়া তায় পরম সাদরে।
বসাইয়া লয়ে গিয়া আপন মন্দিরে।।
আহ্লাদের সীমা নাই সাহেবের মনে।
লক্ষণে ফুটিল ভীতি প্রফুল্ল বদনে।।
শ্রীপ্রভু পরশমণি পরশনে যাঁর।
জীবের জীবত্ব নষ্ট লোচন আঁধার।।

(শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি)

উইলিয়ামস সাহেব ঠাকুরের কাছে কয়েকবার যাতায়াত করবার পরেই তাঁকে ঈশ্বরাবতার–“নিত্যচিন্ময় বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি”–বলে জানতে পারেন এবং ঠাকুরের উপদেশে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে যান।

অপর আর একজন খ্রীষ্টান সাধকও ঠাকুরকে অবতার পুরুষ বলে চিনতে পারেন। তাঁর নাম প্রভুদয়াল মিশ্র।

উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রভু নাম তাঁর।।
পিতামহ খ্রীষ্টিয়ান, জন্ম সেই কুলে।
মুলে কিন্তু কনোজিয়া ব্রাহ্মণের ছেলে।।

(পুঁথি)

ঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্যে শ্যামপুকুরে ছিলেন তখন প্রভু দয়াল তাঁর পুণ্য দর্শন লাভ করেন। একই দিনে তাঁর দুই ভাই দৈব দুর্বিপাকে নিহত হলে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পান এবং সংসার ত্যাগ করে ত্যাগী জীবন যাপন করতে থাকেন।

মিশ্রের সংস্কার ছিল খুবই উঁচু। ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলে চিনতে পারেন। কথামৃতে তাঁর উপলব্ধির কথা আছে–“ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন– আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

আপনারা (ভক্তরা) এঁকে চিনতে পারছেন না। আমি আগে থেকে একে দেখেছি – এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম – একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেঝের উপর আর একজন বসে আছেন। তিনি তত আডভান্সড (উন্নত) নন।”

ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বলেছিলেন–‘তুমি যা চাইছ, তা হয়ে যাবে।’ তারপর ঠাকুরের যীশুর ভাব হয়, তখন মিশ্র করযোড়ে ঠাকুরকে বলেন, ‘আমি সেদিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর – সব আপনাকে দিয়েছি।’

(কথামৃত ৪/৩০/২)

মুখের খোঁজে **সুনন্দন ঘোষ**

শুরুতে দায় ছিল আত্মরক্ষার,
ছিল অনভ্যাস।
ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চার পা হাঁটার পর দেখতাম
সিকিউরিটির কোঁচকানো ভুরু, ইস্ত্রীওয়ালার চোখে বিস্ময়।
তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা।
মাস্ক নিতে ভুলে গেছি।
এখন মানিব্যাগ নিতে ভুল হয়, মাস্ক নিতে নয়।

বদলে যাচ্ছি আমরা।
ক্রমশঃ মুখোশের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে মুখের অভিব্যক্তি।
হারিয়ে যাচ্ছে সৌজন্য,
ফুরিয়ে যাচ্ছে আত্মবিশ্বাস।
বাঁচার তাগিদে বাঁচার মানেটাই ভুলে যাচ্ছি।
ফেসবুকে আর.আই.পি লিখে আমরা আত্মজনের
শেষযাত্রায় কাঁধ দেওয়ার দায়িত্ব চুকিয়ে ফেলি।
বন্ধুকে দরজা থেকেই কাজের কথা সেরে বিদায় করি।
শীতের সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে কাশির শব্দ শুনলেই
মাথার মধ্যে আরজিকর, বাঙ্গুর, র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট ......

অনেকগুলো দিন কেটে গেলো।
জীবনকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে
মুখোশটা চামড়ায় মিশে যাচ্ছে।
সময় কম।
পুরনো মুখগুলোকে আলোয় আনতে হবে নতুন করে।

DO NOT COPY